

কুফরের পনেরো রূপ

শায়খ আবদুল্লাহ আল-ফায়সাল আল-জামাইকী



AHLUL HAQQ
publications

কুফরের পনেরো রূপ

শায়খ আবদুল্লাহ আল-ফায়সাল আল-জামাইকী

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications



কুফরের সংজ্ঞা:

কুফর শব্দটি এসেছে কাফারা মূল শব্দ থেকে, যার অর্থ হলো ঢেকে রাখা বা লুকানো। সুতরাং, কাফির হলো সেই ব্যক্তি যিনি হাক্ক (সত্য) লুকান বা অস্বীকার করেন।

কুফর বড় অথবা ছোট হতে পারে।

এখানে আমরা বড় কুফর সম্পর্কে আলোচনা করব, অর্থাৎ সেই কুফর যা একজনকে ইসলামের বাইরে বের করে দেয়।

ছোট কুফরের উদাহরণ হলো; মদ্যপান করা, জিনা করা, একজন মুসলিমের সাথে লড়াই করা ইত্যাদি।

যদি কোনো ব্যক্তি একজন মুসলিমের সঙ্গে লড়াই করে, তা ছোট কুফর হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ আল্লাহ ﷻ কুরআনে তাদের মু'মিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

“আর মুমিনদের দু’দল দ্বন্দ্বেলিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপোষ-মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায্যবিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায্যবিচারকদেরকে ভালবাসেন।”[আল-হুজুরাত ৪৯:৯]



এই আয়াত নাজিল হয়েছিল যখন সাহাবাগণের رضي الله عنهم দুই দল একে অপরের সাথে লড়াই করছিলেন। আল্লাহ (সর্বশক্তিমান) তাদের তবুও মু'মিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বড় কুফর তখনই ঘটে যখন কেউ বিশ্বাস করে যে মুসলিমদের হত্যা বা তাদের সাথে লড়াই করা হালাল। নিচের হাদিসটি ছোট কুফরের উদাহরণ:

ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“একজন মুসলিমকে অপমান করা ফাসিকতার দিকে যাওয়া, আর তাকে হত্যা করা কুফর।”[সহীহ বুখারি (৪৮), মুসলিম (৬৪)]

কুফরের ১৫ টি রূপের পরিচিতি:

১. কুফর আল-ইনকার:

এর অর্থ হলো সেই জিনিস অস্বীকার করা যা জরুরি জ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেই মুহূর্তে কেউ এই শাখার জ্ঞান অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায়।

উদাহরণ: নাস্তিকতা — আল্লাহ ﷻ ’র অস্তিত্ব অস্বীকার করা। ফিরআউন এই কুফরের জন্য দায়ী ছিল।

“আর ফির‘আউন বলল, ‘হে পরিষদবর্গ ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে জানি না ! অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; হয়ত আমি সেটাতে



উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পারি। আর আমি তো মনে করি, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অভর্ভুক্ত।”[আল-কাসাস ২৮:৩৮]

ফিরাউনের মনোভাব ছিল, সে তার সৈন্যদের একটি টাওয়ার বানাতে বলেছিল যাতে প্রমাণ করা যায় উপরে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। এই মনোভাবকে ইনকার বলা হয়।

আবু বকর رضي الله عنه এর খিলাফতের সময় যারা যাকাত অস্বীকার করেছিল তারা কুফর আল-ইনকার করেছিলেন।

যারা ঈমানের স্তম্ভ, যেমন রুদর অস্বীকার করে, তারা একই কুফর করে।

আতা বিন আবি রাবাহ رضي الله عنه বলেন:

“আমি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর কাছে গেলাম, দেখলাম তিনি জমজমের কূপ থেকে পানি তুলছেন। তার পায়ের নীচের কাপড় ভিজে আছে। আমি তাকে বললাম, ‘কাদর নিয়ে তারা কথা বলেছে (কেউ কেউ এটি অস্বীকার করেছে)’। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কি এটা করেছে?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম! এই আয়াত শুধু তাদের জন্য নাজিল হয়েছে: (জাহান্নামের যন্ত্রণা আশ্বাদন করা নিশ্চয়ই আমরা সমস্ত কিছুকে কাদর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি)। তারা এই উন্মত্তের সবচেয়ে খারাপ লোক। তাদেরকে দেখতে যাবে না, তাদের মৃতের জন্য জানাজা করবে না। যদি আমি তাদের একজনকে দেখি, আমি আমার দুই আঙুল দিয়ে তার চোখ বের করে



দিতামা’[তাফসীর ইবনে কাসির (৭/৪৮৩), তাফসীর ইবনে আবি হাতিম (১০/৩৩২১) নং ১৮৭১৫, ইথাফুল-খিয়ারা আল-মাহারা আল-বুসাইরি (৬/২৮০) নং ৫৮৪৬[এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বাসযোগ্য]।

২. কুফর আল-শাক্ব:

এটি তখন ঘটে, যখন কেউ ইসলামের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

যেই মুহূর্তে আপনি ইসলামের কোনো মূল বিষয়ে সন্দেহ করবেন, তখনই তখনই ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যাবেন।

যদি আপনি সন্দেহ করেন যে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল কি না, অথবা সন্দেহ করেন যে তিনি ﷺ শেষ নবী কি না — তাহলে আপনি সন্দেহের কারণে কুফর করেছেন।

যেই মুহূর্তে আপনি পুনরুত্থান দিবস নিয়ে সন্দেহ করবেন, সেই মুহূর্তেই আপনি কাফির হয়ে যাবেন।

আল্লাহ ﷻ এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলেছেন সূরা আল-বাকারাহ ২:১০ আয়াতে —



“তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি(সন্দেহ ও নিফাকের)। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।”[আল-বাকারাহ:১০]

উপরের আয়াতে আল্লাহ ﷻ যে “রোগ” এর কথা বলেছেন, সেটি হলো সন্দেহ। যদি আপনি আপনার ঈমান নিয়ে সন্দেহ করেন, আপনি কাফির।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন:

“তরাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তরাই সত্যনিষ্ঠ।”[আল-হুজুরাত:১৫]

উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, আপনার শাহাদাহ (কালিমা)-এর সাতটি শর্ত রয়েছে, আর তার মধ্যে একটি হলো ইয়াকীন (নিশ্চয়তা/নিশ্চিত বিশ্বাস)।

[অনুবাদক: শাহাদাহ-এর শর্তসমূহ জানতে আমাদের সংকলিত “দ্বীন ইসলামের মূলভিত্তি” বইটি পড়ুন।]

যদি আপনি সন্দেহ করেন যে কুরআন আল্লাহর বাণী কি না, তাহলে আপনি ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যাবেন।



উদাহরণ হিসেবে —

দুইজন ব্যক্তি,

প্রথমজন ব্যভিচার করে, অনৈতিক সম্পর্ক রাখে, প্রতারণা করে। তার ঈমান ও তাকওয়া দুর্বল, সে জিনার (ব্যভিচারের) থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না। কিন্তু সে আল্লাহ, ইসলাম ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে।

দ্বিতীয়জনের হৃদয়ে রয়েছে সন্দেহের রোগ। সে সন্দেহ করে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে, এবং ইসলামের বহু মৌলিক বিষয়ে।

সমস্ত আলেম একমত যে, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করেছে, সে এখনো মুসলিম। কিন্তু যে ব্যক্তির হৃদয়ে সন্দেহ আছে, সে কাফির। কারণ ব্যভিচার (জিনা) কাউকে কাফির বানায় না, কিন্তু নিজ ধর্ম নিয়ে সন্দেহ করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়।

৩. কুফর আল-ই‘রাদ:

“ই‘রাদ” শব্দটি আক্বীদাহ ও ফিকহের আলেমরা ব্যবহার করেন।

এর অর্থ হলো — আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, এবং তা শিখতে অস্বীকার করা। এ পরিমাণ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যে কেউ সূরা ফাতিহা বা আযান



পর্যন্ত জানে না। কেউ যদি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে না পারে তাহলে সে কাফির।

“ই‘রাদ” শব্দটি ফিকহের আলেমরাও ব্যবহার করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ:

যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়/পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে অস্বীকার করে। এটিকে বলা হয় ই‘রাদ। নারীও একইভাবে এমন করতে পারে। এটি বিচ্ছেদের একটি কারণ হিসেবে গণ্য হয়।

ই‘রাদ অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা, বিমুখ হওয়া/মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “নাওয়াফিদ আল-ইসলাম” (ইসলামকে বাতিল করে দেয় এমন দশটি বিষয়)-এ দশম নাক্বিদ (বাতিলকারী বিষয়) হিসেবে “ই‘রাদ” উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

“দশম: আল্লাহর ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তা শেখে না বা তা অনুসরণ করে না (এটি কুফর)।

এ বিষয়ে প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:



‘তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হলে সে তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি অপরাধীদেরকে শান্তি দেব।’[আস-সাজদাহ:২২]

‘ই’রাদ’ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন, ‘আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, ‘হে আমার রব! কেন আমাক অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুস্থান। তিনি বলবেন, ‘এরূপই আমাদের নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ছেড়ে দিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখা হবে।’[আত-ত্ব হা:১২৪-১২৬]

৪. কুফর ইস্তিকবার:

ইস্তিকবার হলো অহংকার, গর্ব ও উদ্ধততার কুফর। এটাই ছিল শয়তানের কুফর। শয়তানের পতন।

“আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, আমাকে সিজদা কর, তখন ইবলিশ ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল। আর সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”[আল-বাকারাহ:৩৪]



এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ শয়তানের ওপর তাকফির করেছেন। যখন কারও গর্ব ও অহংকার তাকে আল্লাহর অবাধ্য করে তোলে, তখন সে কাফির হয়ে যায়।

যদি আপনার অহংকার আপনাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে তাহলে আপনি কাফির।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: “যার অন্তরে এক সরিষা দানার সমান অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” এক ব্যক্তি বলল: “মানুষ তো চায় তার পোশাক সুন্দর হোক, জুতো সুন্দর হোক।”

নবী ﷺ বললেন: “আল্লাহ সুন্দর, এবং তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।”[সহীহ মুসলিম, ১/৯৩, হাদীস ৯১]

অর্থাৎ, নবী ﷺ যে অহংকারের কথা বলেছেন, তা হলো সেই অহংকার, যা মানুষকে হক্ক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করায়। আমাদের সবার মধ্যেই কোনো না কোনো পরিমাণ অহংকার আছে, কিন্তু যখন সেই অহংকার এমন মাত্রায় পৌঁছায় যে আপনাকে হককে প্রত্যাখ্যান করায়, তখন আপনি কাফির হয়ে যান। নমরুদের দুর্দশার কারণও ছিল তার অহংকার। এটিই তার পতন ডেকে আনো। সে নবী ইবরাহীম عليه السلام এর সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সে বলেছিল, “আমি আল্লাহর মতো জীবন দিই ও মৃত্যু দিই।” তখন ইবরাহীম عليه السلام বললেন: “আমার রব সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো।” ফলে সেই কাফির চুপসে গেল।[আল-বাকার:২৫৮]



মুসা عليه السلام-এর যুগের অহংকারী অবিশ্বাসীরা অহংকার ও জেদ করে মুসা عليه السلام এর আনা নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলল, যদিও তাদের অন্তর নিশ্চিত ছিল যে তা সত্য।

“আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।” [আন-নামল:১৪]

৫. কুফর আল-ইস্তিহলাল:

‘ইস্তিহলাল’ অর্থ হলো — আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেটাকে হালাল বলা, বা যা হালাল করেছেন সেটাকে হারাম বলা।

যদি কেউ মদ পান করে, সে কাফির নয়। কিন্তু যদি সে বলে, “মদ হালাল,” তাহলে সে কাফির, কারণ সে ইস্তিহলালের কুফর করেছে।

যখন কেউ ইস্তিহলাল করে তখন মূলত সে বিধান প্রণয়ন করে। আর বিধান প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

যে ব্যক্তি নিজে থেকে বিধান প্রণয়ন করে, তাকে বলা হয় যিন্দিক(ধর্মদ্রোহী)।



নিচের আয়াতটি ইস্তিহলালের কুফর সম্পর্কে:

“তোমরা (হে মুমিনগণ) সেই (মাংস) থেকে খেও না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি (যবেহ করার সময়), নিশ্চয়ই এটি ফিসক (অর্থাৎ পাপ ও আল্লাহর অবাধ্যতা)। আর নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের অনুপ্রেরণা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর [অর্থাৎ মৃত পশুর মাংস খাও যা আল্লাহ হারাম করেছেন], তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে। [কারণ তারা (শয়তান ও তাদের বন্ধুরা) তোমাদের জন্য সেই জিনিসকে বৈধ (হালাল) করে দিল, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য অবৈধ (হারাম) করেছেন — আর তোমরা তাদের আনুগত্য করেছিলে, তা বৈধ মনে করে। আর এভাবে তোমরা তাদেরই উপাসনা করেছিলে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা হলো শিরক (বহুদেববাদ)] [আল-আন’আম:১২১]

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট— আরবের মুশরিকরা মৃত পশুর মাংস খেত এবং মুসলমানদেরও তা খাওয়ার আহ্বান জানাত। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে



প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।”[আন-নিসা:৬০]

“তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগিদের কে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মার’ইয়াম- পুত্র মসীহ্ কেও। অথচ এক ইলাহের ‘ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নাই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত না পবিত্র।”[আত-তাওবা ৯:৩১]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ رحمه الله বলেছেন:

“যখন কোনো ব্যক্তি এমন কিছু হালাল বলে যা উলামাদের ইজমা অনুযায়ী হারাম, অথবা হারাম বলে যা ইজমা অনুযায়ী হালাল, অথবা শরিয়াহর এমন বিধান পরিবর্তন করে যা নিয়ে ইজমা রয়েছে — তখন সে ফকিহদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়।”[আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬৭]

৬. কুফর আল-নিফাক:

নিফাকের কুফর হলো কপটতা বা ভণ্ডামি। এটি তখন ঘটে, যখন কেউ মুসলমান সাজে, কিন্তু আসলে ইমান আনে না। এ ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে সন্দেহকারী ব্যক্তির থেকে ভিন্ন। এই ব্যক্তি মোটেও ইমান আনে না, ইমান আনার ভান করে। আর



যে ব্যক্তি ইসলাম নিয়ে সন্দেহ করে বলে — “হয়তো/হতেও পারে”। এরা দুজন এক নয়।”

মুনাফিকরা হলো আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ:

আল্লাহ ﷻ বলেন, “নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে, এবং তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।” [আন-নিসা:১৪৫]

কেন কেউ মুসলমান সাজে — চারটি কারণ:

১. আপনার সাথে সম্পর্কের সুবিধা নিতে।

২. মুসলমানদের সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে চায়। তারা আপনার জন্য ইসলাম গ্রহণ করে যেন আপনি তাদেরকে ভরণপোষণ দেন বা সাহায্য করেন। আমি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম তখন কিছু লোক যাকাতের অফিসে আসে এবং তারা যাকাত চায় কারণ তারা মুসলিম এবং যাকাতের হক্কদার। শাইখ তাদের সূরা ফাতিহা পড়তে বলেন — কিন্তু তারা পারেনি। এরা ছিল মুনাফিক, মুসলিম উম্মাহর সম্পদ থেকে উপকৃত হতে চেয়েছিল।

৩. একজন সুন্দর মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এবং সে জানে মুসলমান না হলে বিয়ে সম্ভব নয়, তাই সে শাহাদায় দেয়(অর্থাৎ কালিমা পড়ে) — ভুয়া শাহাদাহ।



৪. মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য তাকে গোয়েন্দা সংস্থা FBI, CIA, MI5 স্থাপন করেছিল।

একজন গুপ্তচরকে চেনার উপায়:

যখন সে মসজিদে আসে সে ওজু না করেই নামাজ পড়ে। FBI তাকে এটা শেখায়নি। ওজু করলেও ভুলভাবে করে (যেমন ডান হাতের আগে বাম হাত ধোয়া)। নামাজে দাঁড়িয়ে বাম হাত ডান হাতের ওপরে রাখে। সে সন্দেহজনক প্রশ্ন করে — যেমন: “তুমি কখন দাওলাহতে যাচ্ছ?”, “তোমার ফ্লাইট কবে?” তার কলম বা পকেটে থাকা ডিভাইস আসলে রেকর্ডার। সে প্ররোচনাদানকারী এজেন্ট — যাকে বলে entrapment.

[অনুবাদক: এগুলো আসলে অতি সাধারণ হিন্টস, আমার মনে হয় না এই সময়ে এসে কোনো গোয়েন্দাসংস্থা এমন ভুল করবে যখন আলিম-উলামাদের জায়গাতেই গোয়েন্দাদের কর্মী বসে লিড দিচ্ছে। তবে মহান আল্লাহ ﷻ যদি তাদেরকে ভুল করিয়ে আমাদের সতর্ক করে দেন তাহলে ভিন্ন কথা।]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

‘মধ্যে চারটি গুণ আছে, সে খাঁটি মুনাফিক; আর যার মধ্যে এর একটি গুণ আছে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি দিক থাকবে যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে — যার

১. যখন তাকে আমানত দেওয়া হয়, সে থিয়ানত করে;



২. যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে:

৩. যখন অঙ্গীকার করে, তা ভঙ্গ করে:

৪. যখন ঝগড়া করে, সত্য থেকে সরে গিয়ে মিথ্যা বলে।’

[সহীহ বুখারী: ৩৪, সহীহ মুসলিম: ৫৮]

৭. কুফর আল-ইস্তিহযা:

ইস্তিহযা হলো দ্বীনের উপহাস বা বিদ্রূপ করার কুফর।

“আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেলা-তামাশা করছিলাম।’ বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। আমরা তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী।’” [আত-তাওবা: ৬৫-৬৬]

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাদেরকে তাকফির (কাফির সাব্যস্ত) করেছেন যারা দ্বীনকে উপহাস করে।



“কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না, নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফিক এবং কাফের সবাইকে আল্লাহ তো জাহান্নামে একত্র করবেন।” [আন-নিসা:১৪০]

যে ব্যক্তি এমন আসরে বসে থাকে যেখানে দ্বীনের উপহাস করা হয়, সে ব্যক্তি ইসলামের গন্ডির বাইরে বের হয়ে যায় — অর্থাৎ কাফির হয়ে যায়। আপনার জন্য এমন আসরে বসা অনুমোদিত নয় যেখানে দ্বীনের উপহাস করা হয়।

কেউ যদি কোনো মহিলাকে নিকাব পরার কারণে “নিনজা” বলে তাহলে সে কাফির।

কেউ যদি নামাজ, দাঁড়ি, আজান নিয়ে উপহাস করে তাহলে সে কাফির হয়ে যায়।

অনুবাদক: আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ, তাঁর আয়াত-বিধান এবং ইসলামের শাংআইর (চিহ্ন, প্রতীক) নিয়ে যে ব্যক্তি হাসি-ঠাট্টা করে সে ব্যক্তি কাফির। এবং এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির এটা জানা থাকা প্রয়োজন নেই যে সেই কাজটা কুফর কি না। অর্থাৎ সে যদি নাও জানে যে এই কাজটা কুফর তবুও সে হাসি-ঠাট্টা করার



জন্য কাফির হয়ে যাবে। ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেলা-তামাশা করছিলাম।’ বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।’

এবং এমন আসরে বসা যেখানে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করা হয়, এটা ব্যক্তি কাফির বানিয়ে দিবে, “যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না, নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে।”

৮. অবাধ্যতার কুফর:

শয়তান এই কুফরে লিপ্ত হয়েছিল, যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

আর স্মরণ করুন, আমরা যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, ‘আদমের প্রতি সাজদাহ কর’, তখন তারা সবাই সাজদাহ করল ইবলীস ছাড়া; সে ছিল জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু। যালেমদের এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট! [আল-কাহফ:৫০]



সে ছিল মু'তামিল (রূপক অর্থে)। মু'তামিলারা যুক্তিবাদী। সে (ইবলীস) ভেবেছিল সে আদম عليه السلام এর থেকে উত্তম।

আল্লাহ বললেন:

‘আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না?’ সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।’ [আল-আ'রাফ:১২]

৯. আল্লাহ ﷻ বা তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা আরোপের কুফর:

প্রত্যেকটি মিথ্যা কাউকে কাফির বানায় না। যেমন— যদি কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সময় নিজের বয়স নিয়ে মিথ্যা বলে, এটি প্রতারণা তবে এটি ছোট কুফর, বড় কুফর নয়।

কিন্তু যখন কেউ আল্লাহ ﷻ-এর নামে মিথ্যা বলে, তখন সে কাফির হয়ে যায়।



“আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।”[আস-সাফ:৭]

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বানায় — সে কাফির, জিন্দিক (অর্থাৎ ধর্মদ্রোহী)। সে আসলে নিজের মনগড়া ধর্ম তৈরি করতে চায়। আর সে জাল হাদিস উদ্ধৃত করতে পছন্দ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলে, সে যেন জাহান্নামে নিজের জায়গা প্রস্তুত করে রাখে।”[সহিহ বুখারি, খণ্ড ১, বই ৩, হাদিস ১০৮]

নবী ﷺ বলেছেন: “সে যেন জাহান্নামে নিজের জায়গা প্রস্তুত করে রাখে” অর্থাৎ এটি স্থায়ী আবাস, কারণ রাসূলের নামে মিথ্যা বলা বড় কুফর। যেমন, “আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী হলো তার দরজা।”

— ইমাম বুখারি এই হাদীসকে জাল বলেছেন।

যে ব্যক্তি ঘুষ নিয়ে শরীয়াহ আদালতে অন্যায় রায় দেয়, সে ব্যক্তি কাফির। এটি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপের কুফর।



ইবনু মাস‘উদ رضي الله عنه-কে ইরাকের কিছু লোক জিজ্ঞাসা করল: “ঘুষ নেওয়া (রিশওয়া) কী?” তিনি বললেন, “এটি সুহত (হারাম উপার্জন)”। তারা বলল, “না, আমরা বিচার সংক্রান্ত ঘুষের কথা বলছি।” তিনি বললেন, “এটাই তো প্রকৃত কুফর।” এরপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন:

“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির।” [সূরা আল-মায়িদা:৪৪]

[তাফসির আত-তাবারি (১০/৩২১), তাফসির ইবন কাসির (৩/১১৯)]

১০. ইস্তিবালাল এর কুফর:

এটি মানব রচিত আইন দিয়ে আল্লাহর শরিয়াকে প্রতিস্থাপন করার কুফর। মুসলিমদের মধ্যে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে যে, যে কেউ শরীয়াহ (আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান) প্রতিস্থাপন, পরিবর্তন, বাতিল করে সে একজন কাফির।

ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله বলেছেন,

“এটি দ্বীন ইসলামের অত্যাবশ্যকভাবে জানা বিষয় এবং সমস্ত মুসলমানের সর্বসম্মত মত যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণকে বৈধ মনে



করে অথবা মুহাম্মাদ ﷺ -এর শরিয়াহ ব্যতীত অন্য কোনো শরিয়াহ অনুসরণ করা বৈধ মনে করে, সে কাফির। তার এই কুফর ঠিক সেই ব্যক্তির মতো, যে কুরআনের একাংশে বিশ্বাস করে, আর একাংশ অস্বীকার করে।” [মাজমু‘আ আল-ফাতাওয়া ২৮/৫২৪]

আল-হাফিয ইবন কাসির বলেছেন,

“যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ – শেষ নবী – এর উপর অবতীর্ণ স্পষ্ট শরিয়াহ ছেড়ে এটি ব্যতীত অন্য কোনো কুফরি আইনের বিধান গ্রহণ করে, সে কুফুরি করেছে। তাহলে সে ব্যক্তির কী অবস্থা, যে ‘ইয়াসিক’ (তাতারদের আইন, যেখানে শরিয়াহ ও মানবরচিত আইন মিশ্রিত ছিল)-কে শরিয়াহর উপরে স্থান দিয়েছে? যে এমনটি করে সে কুফুরি করেছে, সে মুসলমানদের ইজমা দ্বারা কাফির।” [আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১১৯]

শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায বলেছেন:

“যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে মানুষের তৈরি আইন, মতামত বা রায়

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর হুকুমের চেয়ে উচ্চতর, সমান, বা তদ্রূপ, কিংবা যে ব্যক্তি এটি (আল্লাহর শরীয়াহ) ত্যাগ করে বা মানুষের উদ্ভাবিত আইন ও প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, এমনকি সে যদি মনে করে যে আল্লাহর আইন সর্বাধিক ন্যায্যবিচারপূর্ণ তবুও সে ঈমানহীন (কাফির)।” [Wujūb Tah’kīm Sharī‘ah Allāh, পৃষ্ঠা ১৬–১৭]



১১. ওয়ালা – আনুগত্যের/সাহায্য-সহযোগিতার কুফর:

ইসলামের শত্রুদের পাশে দাঁড়ানো/পক্ষ নেওয়া। এর অর্থ হলো ইসলামের শত্রুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা। মুসলিমদের হত্যা করতে তাদের সহায়তা করা।

এটি বর্তমানে সৌদি রাজ-পরিবার এবং পাকিস্তান সরকারের প্রথা।

“আপনি পাবেন না আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে --- হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রুহ দ্বারা। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্ দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।” [আল-মুজাদালাহ ৫৮:২২]

এটি হলো সৌদি রাজপরিবারের দুর্দশা।



ইবন হাজম আল-মুহাল্লা (১১/১৩৮)—এ বলেছেন:

“যা সঠিক তা হলো, তাঁর ﷺ বাণী, ‘আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।’ [মায়েদা:৫১]— এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ীই বোঝা উচিত। উল্লেখিত ব্যক্তি সাধারণ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত একজন কাফির। এবং এটি এমন এক সত্য, যার ব্যাপারে দুইজন মুসলিমের মধ্যেও কোনো মতভেদ নেই।”

“হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।” [আল-মায়েদা:৫১]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله দশটি এমন কাজ উল্লেখ করেছেন যা ইসলাম বাতিলকারী বিষয়, যাদের মধ্যে অষ্টমটি হলো: “মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা এবং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমর্থন করা (এটি এমন কাজ যা ইমানের পরিপন্থী)।” প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী “আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয়



তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।”[আল-মায়দা:৫১]

শায়খ বিন বায (আল-ফাতাওয়া ১/২৭৪) বলেছেন:

“উলামাদের মধ্যে ইজমা আছে যে, যে কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সমর্থন করে, যে কোনো ধরনের সাহায্য দিয়ে তাদের সহায়তায় করে, তাহলে সে সেই কাফিরদের মতোই কাফির।”

শায়খ আবদুল লাতিফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আশ-শায়খ رحمه الله বলেছেন:

“যে কেউ কাফিরদের সাহায্য করে বা তাদেরকে আহলুল ইসলামের (ইসলামের মানুষ/মুসলিমদের) দেশে নিয়ে আসে, তাহলে সে ইজমা অনুযায়ী স্পষ্টভাবে মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী/কাফির)।”[আদ-দুরার আস সানিয়াহ ৮/৩২৬]

অনুবাদক: বরাবরের মতো আল-সাউদের যাদুকরেরা তাদের মনিবদের বাঁচাতে এক বিদআত নিয়ে হাজির, আর তা হলো “দুনিয়াবি স্বার্থে(অর্থ-সম্পদ-পদ-পদবি'র লোভে) মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা বড় কুফর নয়, যদি সে কুফরকে(তাদের ধর্মকে) ঘৃণা করে। তাদের এমন দাবি তাদের দ্বীন ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দেয়। এখন আমরা দেখবো “নাজদী উলামাদের



মতে দুনিয়াবি স্বার্থে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার বিধান, যদিও সে কুফরকে ঘৃণা করে:”

ইমাম, মুওয়াহহিদ, মুহাদ্দিস, ফাক্বিহ, মুজাহিদ, শাহীদ, শায়খ-আল ইসলাম সুলাইমান ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইননে আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله বলেন,

“জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন— যদি কোনো ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে মুওয়াফাকাহ প্রদর্শন করে— হয় তাদের ভয়ে, অথবা তাদের প্রতি মুদারাহ, অথবা মুদাহানাহ করে তাদের ক্ষতি এড়াতে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তাদের মতোই কাফির— যদিও সে তাদের দ্বীনকে ঘৃণা করে, তাদেরকে অপছন্দ করে, এবং ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ভালোবাসে।”[আদ-দালাইল]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ‘আবদিল-লাতীফ আল আশ-শাইখ رحمه الله ব্যাখ্যা করেছেন:

“রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ‘যে কেউ মুশরিকের সাথে যুক্ত হয় এবং তার সাথে বসবাস করে — তবে সে আসলেই তার মতোই।’ তবে এর মানে এই নয় যে, যে কেউ মুশরিকের সাথে কেবল বসবাস করলেই সে কাফির হয়ে যাবে। বরং, এ (হাদীস) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো — যে ব্যক্তি মুশরিকদের মাঝ থেকে বের হতে



অক্ষম হয়, এবং তারা তাকে তাদের সাথে যেতে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য) বাধ্য করে — তাহলে তার হুকুম হবে তাদের (মুশরিকদের) মতোই, অর্থাৎ তাকে হত্যা করা ও তার সম্পদ দখল করা বৈধ হবে। তবে তার উপর তাকফীরের হুকুম (অর্থাৎ কাফির গণ্য করা) প্রযোজ্য হবে না।

কিন্তু যদি সে কুফরার সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয় লোভের কারণে (দুনিয়াবী উপকারিতার জন্য) বা নিজের ইচ্ছায় (জোর-জবরদস্তির স্বীকার হওয়া ছাড়া), অথবা তাদের শারীরিকভাবে কিংবা তার সম্পদের মাধ্যমে সহায়তা করে — তবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে তার কুফরের হুকুম মুশরিকদের মতোই হবে।” [আদ-দুরার আস-সানিয়াহ (৮/৪৫৬-৪৫৭) এবং মাজমু‘আত আর-রাসাইল ওয়াল-মাসাইল (২/১৩৫)]

ইমাম হামাদ ইবনে ‘আতীক رحمه الله বলেছেন:

“নিশ্চয়ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহায়তা করা (মুযাহারাহ), মুসলমানদের গোপন পরিকল্পনা তাদের সামনে ফাঁস করে দেওয়া, অথবা তাদেরকে কথার মাধ্যমে রক্ষা করা, কিংবা তারা যার (শিরক) উপর রয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা — এর প্রতিটিই ইমানভঙ্গকারী।

সুতরাং যে-ই এগুলির কোনো একটি কাজ করবে — যদি না সে ইকরাহ'র অধীনে থাকে — তবে সে মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী)। যদিও সে অন্তরে কাফিরদেরকে ঘৃণা করে এবং মুসলমানদেরকে ভালোবাসে।” [আদ-দিফা‘ আন আহল আস-সুন্নাহ ওয়াল-ইত্তিবা‘, পৃষ্ঠা ৩১]



শায়খ সুলাইমান ইবনে ‘আবদুল্লাহ রহমে الله বলেছেন:

“এরপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা জানিয়ে দিলেন যে, এদের কুফর এবং স্থায়ী শাস্তির কারণ এই নয় যে তারা শিরকে বিশ্বাস করেছে; কিংবা তারা তাওহীদের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল; কিংবা তারা দ্বীনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছে; কিংবা কুফরকে ভালোবেসেছে — বরং আসল কারণ হলো, তারা দুনিয়ার সামান্য কিছু অংশকে আল্লাহ্র দ্বীন ও রব্বুল ‘আলামীন-এর সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়েছে।”

অতঃপর তিনি বলেছেন:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ١٠٧

‘এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’ [আন-নাহল, আয়াত ১০৭-১০৯]

[আদ-দালায়িল, চতুর্দশ দলীল]

ইমাম হাম্মাদ ইবনে ‘আতীক রহমে الله বলেন:

অধ্যায়: কোন অজুহাত মুশরিকদের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন ও তাদের আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য গ্রহণযোগ্য?



[তিনিটি পরিস্থিতি উল্লেখ করেন, তৃতীয় পরিস্থিতির দ্বিতীয় প্রকার উল্লেখ করা হলো]

(খ) সে বাহ্যিকভাবে (কথা বা কাজে) এমনটা করে, অথচ তার অন্তরে সে তার বিপরীতে অবস্থান নেয় (সে কাফেরদের ঘৃণা করে)। কিন্তু সে তাদের শক্তি ও কর্তৃত্বের অধীনে নেই। সে কেবল নেতৃত্ব পাওয়ার আশায়, অথবা সম্পদের জন্য, অথবা স্বদেশপ্রেমের অতিরিক্ত টানে, অথবা দায়-দায়িত্বের কারণে, অথবা কোনো বিপদের আশঙ্কা থেকে এটা করেছে। এমন ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। তার অন্তরের কুফরের প্রতি ঘৃণা তাকে কোনো উপকার দেবে না।

এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اَسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآٰخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۙ ۱۰۷

'এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' [আন-নাহল, আয়াত ১০৭-১০৯]

অতএব আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের রিদ্দাহ অজ্ঞতার কারণে হয়নি, সত্যকে অপছন্দ করার কারণেও হয়নি, কিংবা বাতিলকে ভালোবাসার কারণেও হয়নি—বরং একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়াবি লোভ-লালসা। তারা দ্বীনকে ছেড়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে। এবং এটাই শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল-ওয়াহহাব-رحمه الله এর কথার অর্থ।" তিনি (শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল-ওয়াহহাব) দশটি নাওয়াকিদ এর শেষাংশে বলেন: “এই



নাওয়াফিদগুলোর ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই—চাই তা কেউ ঠাট্টার ছলে করুক, কিংবা গম্ভীরভাবে, কিংবা তার ধন-সম্পদ ও মর্যাদার ভয়ে করুক। একমাত্র ওজপ্রাপ্ত হলো মুকরাহ (জবরদস্তির শিকার)। আর এসব নাওয়াফিদই অধিকাংশ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। তাই মুসলিমের উচিত এগুলো থেকে সতর্ক থাকা এবং নিজের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা।” [ইমাম হামাদ ইবনে ‘আতীক, দার’ আর-রাদ্দ, পৃষ্ঠা ৫৮২-৫৮৬।]

কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত। এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। আর আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। [আন-নাহল: ১০৬-১০৭]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ‘আবদিল-ওয়াহহাব رحمه الله এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, “(আয়াত উল্লেখ করার পর তিনি বলেন) — সুতরাং আল্লাহ কাউকে ছাড় দেননি, শুধুমাত্র সেই মুকরাহ ব্যক্তি ব্যাতিত, যার অন্তর দৃঢ় থাকে ঈমান ও তাওহীদের উপর। আর এটি তো অবশ্যকর্তব্যভাবে জানা যে—কারো বিশ্বাসকে জোর করে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়; তবে তার কথা এবং কাজকে পরিবর্তন করা সম্ভব। এই আয়াত পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে—যে কেউ কুফরি কথা বলল, অথবা



কুফরির কাজ করল—সে অবশ্যই কাফির হয়ে গেল; তবে ব্যতিক্রম শুধু মুকরাহ, যার অন্তর তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকে। আর আয়াতে যেমন এসেছে, সে কাফির হয়েছে এই কারণে যে—সে আখিরাতের উপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে; তার বিশ্বাস পরিবর্তন করেছে বলে নয়।” [Tārīkh Ibn Ghannām, p344]

শায়খ সালিহ আল-ফাওয়ান বলেন:

“সারসংক্ষেপে, যারা কুফর করে তারা চারটি অবস্থার বাইরে নয়:

ক. সে যা বলে অন্তরেও সেটাই বিশ্বাস করে। এ ক্ষেত্রে তার কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

খ. সে অন্তরে তা বিশ্বাস করে না, তবে তাকে কেউ জোর করেনি বলার জন্য। বরং সে দুনিয়ার লোভের কারণে, অথবা লোকদের খুশি করতে এবং তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে এ কথা বলে। এ ধরনের ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির, আল-কুরআনের আয়াত অনুযায়ী:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ أُسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾

'এটা এ জন্যে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়।' (সূরা আন-নাহল, ১০৭)

এবং একই হুকুম তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে কুফর বা শিরকে লিপ্ত হয় শুধু লোকজনের সঙ্গে একাত্ম হতে— যদিও সে কুফর বা শিরককে পছন্দ করে না,



বিশ্বাসও করে না; কিন্তু সে তা করে শুধুমাত্র দেশপ্রেম, ধন-সম্পদ বা আত্মীয়দের ভালোবাসার কারণে।

গ. সে কুফরি কথা বলে মজা করার জন্য, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য। যেমনটা পূর্বোল্লিখিত সেই সৈন্যদলের ক্ষেত্রে দেখা যায়। [আত-তাওবাহ (৬৫-৬৬) আয়াতের তাফসীরে দেখুন]।

ঘ. সে কুফরি কথা বলে (বা করে) জোর-জবরদস্তির কারণে, নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং তার অন্তর দৃঢ় থাকে ঈমান ও তাওহীদের উপর। এ ধরনের ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হবে, কারণ সে জবরদস্তির শিকার।

প্রথম তিন অবস্থার ক্ষেত্রে, ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়— যেমন কুরআনের আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট জানা যায়। আর এটি তাদের মতকে খণ্ডন করে যারা বলে: কাউকে কাফের বলা যাবে না— যদিও সে কুফরের কথা বলে বা কুফরের কাজ করে—যতক্ষণ না তার অন্তরের অবস্থা জানা যায়।

এবং এটি এক জঘন্য উক্তি, যা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী। বরং এটি বিপথগামী মুরজিয়াদের বক্তব্য।" [শরহ কাশফ আশ-শুবহাত, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪]

১২. কালো যাদুর কুফর:

আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী



করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারুত ও মারুত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিলো। তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, ‘আমরা নিছক একটি পরীক্ষা ; কাজেই তুমি কুফরী করো না!’ তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন যাদু শিখতো যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহ্ অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। আর তারা তা-ই শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো এবং কোনো উপকারে আসত না আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে, (অর্থাৎ যাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো! [আল-বাকারাহ:১০২]

জুন্দুব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি জাদু প্রয়োগ করে, তার জন্য হাদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) হলো তলোয়ারের আঘাত, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড!” [সুনান আত-তিরমিজি (৪/৬০) হাদিস নং ১৪৬০, সুনান আল-দারাকুতনী (৪/১২০) হাদিস নং ৩২০৪, মুসতাদরাক আল-হাকিম (৪/৪০১) হাদিস নং ৮০৭৩, আল-সুনান আল-কাবীর আল-বাইহাকী (৮/২৩৪) হাদিস নং ১৬৫০০, আল-মু’জাম আল-কাবীর আল-তাবারানি (২/১৬১) হাদিস নং ১৬৬৫]

১৩. তাশবীহ-এর কুফর:



তাশবীহের কুফর হলো — আল্লাহ ﷻ-কে তাঁর সৃষ্টির মতো মনে করা বা তাঁর সাথে সাদৃশ্য আরোপ করা।

উদাহরণ,

বলা: “আল্লাহ আমাদের মতোই দেখেন ও শোনেন।”

বলা: “আল্লাহর হাত আছে এবং তা আমাদের হাতের মতো।”

“...কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [আশ-শুরা:১১]

১৪. তামসীল-এর কুফর:

তামসীলের কুফর হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলি মানুষের মাঝে আরোপ করা। শিয়ারা এ কুফরে লিপ্ত, কারণ তারা দাবি করে তাদের ইমামরা ভুলের উর্ধ্বে এবং তারা জানেন কখন তারা মারা যাবেন এবং নিজেরাই মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেন।

শিয়াদের দলীল: “সব ইমাম নবীদের মতোই নিষ্পাপ। শিয়ারা তাদের ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের নিষ্পাপ ইমামদের কাছ থেকে।” [উসূল আল-কাফি, পৃ. ২২]

শিয়াদের দলীল: “ইমামরা জানেন কখন তারা মারা যাবেন, এবং তারা কেবল নিজেদের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন।” [আল-কাফি, খণ্ড ১, পৃ. ২৫৮]

শিয়াদের এই বিশ্বাস — তাদের ইমামরা জানেন কখন তারা মারা যাবেন — নিচের আয়াতের পরিপন্থী:



“নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” [লুকমান:৩৪]

তামসীল, অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলি কোনো মানুষকে আরোপ করা, এটি বড় কুফর। কারণ আল্লাহ বলেন—

“কুফুওয়ান” – শব্দের অর্থ হলো “সমতুল্য” বা “সমান।”

“আসমান ও জমিনে এমন কিছুই নেই যা আল্লাহর সদৃশ বা তাঁর সমান।”

১৫. রিদ্দাহ—এর কুফর:

রিদ্দাহ অর্থ হল ইসলাম ত্যাগ করা। ইসলাম ত্যাগ করার উদাহরণসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

১. আমি আর মুসলিম থাকতে চাই না।
২. ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম।
৩. আল্লাহ অত্যাচারী/নিষ্ঠুর।
৪. মুহাম্মাদ ﷺ একজন মিথ্যা নবী।



৫. কিয়ামত বা বিচারদিবস কল্পকাহিনী।
৬. কুরআন কাহিনীর সাদৃশ।
৭. শরীয়াহ বর্বরতামূলক।
৮. কাফিররা মুসলিমদের চেয়ে উত্তম।
৯. কদর (পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য) নামে কোনো কিছু নেই।
১০. ঈসা عليه السلام রোমানদের দ্বারা খ্রুশবিদ্ধ হন।
১১. সুলায়মান عليه السلام জাদুকর ছিলেন, নবী নন।
১২. হিজাব পরা ফরজ নয় — এটি একটি আরবীয় সংস্কৃতি মাত্র।
১৩. পাঁচজন স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল।
১৪. কুরআনই যথেষ্ট; হাদীস গুরুত্বপূর্ণ নয়।
১৫. গণতন্ত্র ও ইসলাম একই জিনিস। অথবা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা।
১৬. যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো অ-ইসলামিক সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হালাল।
১৭. কাফিরদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করা হালাল, কারণ এটি জীবিকা অর্জনের কাজ।
১৮. কালো জাদু-বলে চালান করা।
১৯. বিশ্বাস করা যে আমরা তারকা থেকে বৃষ্টি পাই অথবা আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো মাধ্যমে।



২০. কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা ও তাদের কাছে চাওয়া।

ইসলাম ত্যাগ করার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। এ কারণে আল্লাহ ﷻ বলেন:

“যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে আর তাদের মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করবে না।” [আন-নিসা ৪:৮৯]

নবী ﷺ আমাদের মুরতাদদের (যারা কুফর-শিরক করে ধর্মত্যাগ করে) হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নলিখিত হাদীসে—

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“যে কেউ (মুসলমান) তার ধর্ম ত্যাগ করে, তাকে হত্যা করো।”

[সহীহ বুখারী (৪/৬১) হাদীস নং ৩০১৭; মুসনাদ আহমদ (১/৩২২) হাদীস নং ২৯৬৮; সুনান আন-নাসাঈ (৭/১০৪) হাদীস নং ৪০৫৯; সুনান ইবনু মাজাহ (৩/৫৭৪) হাদীস নং ২৫৩৫; সুনান আবু দাউদ (৪/১২৬) হাদীস নং ৪৩৫১; সুনান তিরমিযী (৪/৫৯) হাদীস নং ১৪৫৮]

এটি উল্লেখযোগ্য যে, শরিয়াহ মুরতাদদের হত্যা করার বিধান দিলেও, তা কেবল ইসলামী রাষ্ট্রেই কার্যকর করা যাবে এবং শুধুমাত্র একজন ক্বাদী (মুসলিম বিচারক)-এর রায়ের মাধ্যমে। দারুল হারব শরিয়াহর এই বিধান নিজের উদ্যোগে কার্যকর



করা বৈধ নয়।[উল্লেখ্য যে কিছু বিচার/আইন ক্বাদ্বী ব্যাতিতই স্ব-হস্তে নেওয়া যায়, যেমন; শাতিম। আবার এমন মুরতাদ যারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতায় লিপ্ত।]

الصلاة والسلام على رسول الله

